বরাক উপত্যকা ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে

—বিবেকানন্দ মোহন্ত

উত্তর গোলার্ধের অন্তর্গত ২৫°১২—২৪°১০ অক্ষাংশ এবং ৯২°১৫—৯৩°১৫ দ্রাঘিমাংশের অন্তর্বর্তী ভূখণ্ডের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে চিরহরিৎ বনানীঘেরা অতন্দ্র প্রহরী। দক্ষিণ শৈলমালা থেকে লম্বভাবে চারটি প্রশাখা ক্রমশঃ এগিয়ে এসে কোথাও বিলীন হচ্ছে কোন স্বচ্ছ রূপালী রেখায়, আবার কোথাও মিশে যাচ্ছে সবুজ কার্পেটে মোড়া কোন বিস্তীর্ন সমতল ক্ষেত্রে। কোথাও চা-বাগিচার নান্দনিক রূপের ঐশ্বর্য্য নিয়ে উঁচু নীচু অগুণতি টিলা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমে আসছে কোন বিস্তৃত উপত্যকায়। বর্ণময় প্রান্তীয় ভুবনের বুক বেয়ে প্রশস্ত রূপালী রেখা সহায়িকার স্রোতধারার অকুণ্ঠ সহযোগিতায় কোথাও সরল আবার কোথাও সর্পিল গতিতে একূল-ওকূল আশিসে রাঙিয়ে শাখা বিস্তার করে ক্লান্তিহীনভাবে ছুটে চলছে দূর দিগন্তের উদ্দেশ্যে।

অববাহিকার কোমল বুক বেয়ে তার চলার পথে এঁকে চলছে অগুণতি গাঙ্গিনিকা, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, কত ঝিল সরোবর। যেখানে বিল হাওরের সাজানো প্রান্তরে রাতের বুক চিরে জেগে ওঠে মাঝি মাল্লার গলা ছেড়ে জারি-সারি-ভাটিয়ালী সুর, যেখানে মাঠ উপছে পড়া ফসল হাসিমুখে তুলতে ব্যস্ত কোন কৃষকের দল অথবা যেখানে কুয়াশাসিক্ত অঘ্রাণের রাতে বসে নবান্নের পরব - প্রকৃতির স্নেহময়ী এ চিত্রপটই আমের অতুলনীয়া সুরমা-বরাক ভুবন।

মুগ্ধ Sir, W. W. Hunter তাই যথার্থই বলে গেছেন ''The rich vegetation and beautiful forms of the hills, the great fertility of the cultivated lands, the size and beauty of the bamboo groves and fruit threes that surround the cottages of the people, and even the wild and primeval appearance of the great marshes give an richness and picturesque variety to the scenery of Cachar which is generally wanting in the monotonous plains of Eastern Bengal."

উর্বর নরম পলিমাটি দ্বারা গঠিত বিস্তীর্ণ সমতলীয় বরাক ও তার অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে ওঠা সুপ্রাচীন সমতলীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতার উত্থান পতনের সাথে যেমন স্রোতস্বিনীর খেয়ালী চরিত্র অনেকাংশে দায়ী তেমনি দায়ী বহিশত্রুর ঘন ঘন আক্রমণ। অত্যাধিক বৃষ্টিপ্রবন এ উপত্যকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিতে বিভিন্ন জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল সময়ে সময়ে। মাটি খুঁড়তে গিয়ে অজস্র ব্যবহৃত মাটির বাসনকোসনের ভগ্নাবশেষ জানান দেয় যে, বহুকাল আগে এখানে সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল কোন অজানা কারণে।

সুতরাং এত প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে বহু শতাব্দী প্রাচীন কোন প্রত্নকীর্তি আমাদের কালে এসে স্বগৌরব ধরা দেয়ার কথা নয়। তবুও কিছু কিছু স্মারক কোনভাবে আজও টিকে আছে শিবরাত্রির সলতে হয়ে যেটি এক অনুসন্ধিৎসু মনকে এগুলো নিয়ে একটু ভাবার সুযোগ করে দেয়। স্বল্প পরিসর কোন বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে তাই টীকা হিসেবেই এর কিছু উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির ঃ বরাকনদীর বামতীরে করিমগঞ্জ শিলচর মটর ও রেলপথের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির কপিলাশ্রম। বদরপুর লেভেল ক্রশিং থেকে আনুমানিক ৪০০ মিটার পূর্বদিকে এটির অবস্থান। মূলতঃ বরাক নদী আগে প্রবাহিত প্রায় ৮০০ মিটার উত্তর দিকে কিন্তু ১৯১৬ ইং প্রলয়ঙ্করী বন্যায় নরম পলিমাটির পার ভেঙ্গে ভেঙ্গে নদীটির নব্য স্রোতধারা বিশাল পাথর ঘেষে পশ্চিমাভিমুখে চলতে শুরু করে এবং আজও সে ধারাটি অব্যাহত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ঐ বিস্তৃত পাথরের উপরই গোটা কপিলাশ্রম দণ্ডায়মান।

এখানে কালো পাথরের এক বিশাল শিবলিঙ্গ রয়েছে, আছে পাথরের চাতালে কাঁচা হাতে খোদাই করা শ্মশ্রু গুল্ফ নিয়ে পুরুষ অবয়ব এবং দুটো বুদ্ধের মূর্তি ও অন্যান্য বিগ্রহ। কথিত আছে যে সর্ব কর্মসিদ্ধির দেবতা শিবের আরাধনা স্থল হওয়াতে এটির নাম হয়েছে সিদ্ধেশ্বর তীর্থ। লোকশ্রুতি যে, সাংখ্যদর্শনের স্রষ্টা কপিলমুণি এই আশ্রমে বসে শিবের তপস্যা করেছিলেন বলে এ তীর্থকে কপিলাশ্রম বলা হয়ে থাকে। (কপিল + আশ্রম = কপিলাশ্রম)।

জনশ্রুতি যে প্রাচীনকালে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর পোড়ারাজার অধীনে ছিল গোটা অঞ্চলটি। প্রখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার তথা ঐতিহাসিক রাজমোহন নাথের ভাষায় ''Another tradition says that shrine was installed by one Pura Raja, a local chief who was a vassal either of the Tipperah King or of Lokenath, a Governor of the Joytunga-Varsha (i.e. the Jatings Valley) under the suzerainty of the Tipperah King". (source-census of India 1961, Assam, Dist. census hand book Cachar, page-6)। কথিত আছে যে, পোড়া রাজার মাছের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল, সারা বছর জ্যান্ত ও পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া দুস্কর, তাই তাঁর ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতিতে মাছের শুটকি বিশাল কালো পরশপাথর কেটেই পরবর্তীকালে শিবলিঙ্গ তৈরি করে এ মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছিল। এ আশ্রম-মন্দিরকে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর বারুণীস্নান ও বারুণীমেলা হয়ে থাকে নদীর অপর পারের বিস্তীর্ণ মাঠে।

সিদ্ধেশ্বর এবং ভূবন পাহাড়ের ধর্মাচারকে আমরা ডি. ডি. কৌসাম্বীর মতের অনুসরণে আমাদের প্রাচীনতম ইতিহাসের জীবন্ত স্মারক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

ভূবন তীর্থ সংস্কৃতি ঃ কাছাড়া-মণিপুরের সীমানা স্বরূপ উত্তর দক্ষিণে দাঁড়িয়ে আছে ভুবন পাহাড় যার শীর্ষদেশ (আনুঃ ৩০০০ উচ্চতায়) সুপ্রাচীন শৈব সংস্কৃতির প্রত্নস্থল হিসেবে আজও ভ্রমণ পিপাসুদের অনুসন্ধিৎসু মন কেড়ে নেয়। শিলচর থেকে প্রায় ২৫ কিঃ মিঃ দূরে ভুবন পাহাড়ের পাদদেশে মতিনগর বাজার, বলা যায় গেইটওয়ে অফ ভুবন তীর্থ। এখান থেকে পায়ে হেঁটে প্রায় ১০ কিঃ মিঃ ক্রমাগত উপরে উঠে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হয়। প্রায় শীর্ষদেশে পৌঁছার আগে পাওয়া যায় একটি সমতল এলাকা-যেটিকে আচ্ছাদন করে আছে পাথরের চাল বা খাড়াই পাহাড়ে একপাশে ভর করে লম্বভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে। এখানে পাওয়া যায় দু'টি পাথরের প্রতিমা, একটি ভুবনপাহাড়ের অধীশ্বর ভুবনেশ্বর এবং অন্যটি সম্ভবত তাঁর সহধর্মিনী ভুবনেশ্বরী। সাম্প্রতিককালে আরও অনেক পাথরের মূর্তি, যেগুলো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে রয়েছিল, সেসব সংগ্রহ করে নবনির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

পাতলা গড়নের বেলে পাথর কেটে তৈরি ৩ x ৯ উচ্চতার দণ্ডায়মান ভুবনেশ্বর প্রতিমাটি এক উন্নত শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। বাম হাতটি উপর দিকে কনুই পর্যন্ত প্রসারিত এবং বুক স্পর্শ করে আছে ডান হাত। বিন্যস্ত কেশবিন্যাস ও সুমখশ্রী নিয়ে সন্দীপ্ত দৃষ্টি শিল্পীর কারিগরী দক্ষতার পরিচায়ক। অন্যদিকে প্রায় ১০ ফুট দূরত্বে ভুবনেশ্বরী বলে অনুমিত নারী মূর্তিটির কোমর থেকে নীচ পর্যন্ত মাটিতে প্রোথিত হয়ে আছে। ডান হাত ভাঙা, দক্ষিণমুখী

এ মূর্তিটির কর্ণযুগলে শোভিত পাথরের অলঙ্কার কাঁধ পর্যন্ত ছুঁয়ে রয়েছে, বৃহদাকার এ মূর্তিটির উপজাতীয় গড়ন এটিকে আদিম শিল্পচর্চার হস্তাবলেপ বলে অনুমিত হয়। এগুলো ছাড়া, অন্যান্য পাথরের প্রতিমাও এখানে লভ্য। মোকাম টিলার এসব মূর্তি ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চার হাত বিশিষ্ট পাথরের বিষ্ণুমূর্তি এখানে রয়েছে। আগে গরুড় এবং হনুমানেরও প্রতিমূর্তি।

ভূতল গুহা এবং ছাড়মণ্ডপ ঃ ভূবনতীর্থের মোকাম টিলা থেকে প্রায় আড়াই কিঃ মিঃ পূর্বে পৌঁছে আনুঃ ১২০ মিঃ উতরাই পেরিয়ে দেখা যায় এক অর্ধবৃত্তাকার সমতল ক্ষেত্র। যেটিকে ছায়ামণ্ডপ বা আচ্ছাদিত মিলনায়তন বলে অভিহিত করা যায়। বাঁদিকে পাথর কেটে ১´ X ৯´ মাপের ১০´ দীর্ঘ এক টানেল পাওয়া যায়-যাকে যোনীদ্বার বলা হয়ে থাকে। বুকের উপর ভর করে বহুকষ্টে এ জায়গা অতিক্রম করে পাওয়া যায় ৮০´X৩০´X২০´ উচ্চতার এক আয়তাকার অন্ধকারাচ্ছন্ন টানেল, এটি মেল মণ্ডপ বলে পরিচিত (একটি বড় মাপের মিলনায়তন)। এখান থেকে নীচ দিকে প্রায় ৪০০´ প্রশস্থ পেরিয়ে পাওয়া যায় প্রায় সমমাপের দ্বিতীয় মিলনায়তন। এখানে থেকে আরোও প্রায় ৪০০´ নীচ নেমে তৃতীয় মিলনায়তন। ঘোর অন্ধকার এ গুহাকন্দরের ডান দিকের দেয়ালে পরিচয়হীন দুটি পাথরের প্রতিমূর্তি পাওয়া যায়। এই তৃতীয় গুহা থেকে নীচ দিকে প্রায় ১০০ দীর্ঘ আরেকটি পথ যার মধ্যভাবে কালো পাথরের এক পিণ্ড যা থেকে ধারালো দাঁতের আকৃতির ফলক বেরিয়ে আছে চতুর্দ্দিকে, কোনক্রমে গাঁ বাঁচিয়ে একজন লোক এ বাঁধা অতিক্রম করতে পারে। এখান থেকে উর্দ্ধমুখী সরু রাস্তা পাথর কেটে তৈরি করা। এই পথে ৪০০´ এগিয়ে গিয়ে রাস্তার মাঝ বরাবর পাওয়া যায় ত্রিভুজাকৃতি ধারালো পাথর যার সংকীর্ণ পার্শ্বদেশ পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়া অকল্পনীয় ব্যাপার। দুঃসাহসী ব্যক্তি এ বাঁধা অতিক্রম করতেও দ্বিধাবোধ করে। জনশ্রুতি যে, এ বিপজ্জনক পথ পেরিয়ে প্রায় আধমাইল যাওয়ার পর এক বড় আয়তাকার সমতল ক্ষেত্র পাওয়া যায় যেখানে লিঙ্গরূপী শিব বিদ্যমান। লোকবিশ্বাস যে, এ সুড়ঙ্গ পথ ধরে গৌহাটির কামাখ্যায় গিয়ে পৌঁছানো যায়। শিল্পীর হাতে গড়ে ওঠা উক্ত টানেল বা সুড়ঙ্গ পথ এবং স্থানে স্থানে খোদাই করা মিলনায়তনকে 'রদ বা রন্ধ্র' (হোল পেসেজ) বলা হয়, লোকায়ত বিশ্বাস যে এই সুড়ঙ্গ ধরিত্রী মায়ের অর্থাৎ ভুবনেশ্বরীর যোনীপথের অবিকল প্রতিরূপ (রেপলিকা)।

সাদারাশি মহাপ্রভু আখড়া ঃ বৃহত্তর বাংলার পূর্বপ্রান্তিকে চৈতন্যোত্তর পর্বের এক অত্যুজ্জ্বল স্থাপত্যকীর্তির ধ্বংসাবশেষ করিমগঞ্জে শহরের নিকটবর্তী এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম সাদারাশিতে রয়েছে। প্রধানত দাস সম্প্রদায় ভুক্ত কৃষিজীবী বুদ্ধিজীবী এবং ব্যবসায়ী সমাজ অধ্যুষিত এই প্রাচীন জনপদ। আলোচ্য স্থানটি কুশিয়ারকূল হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের প্রায় ৩০০ মিটার পূর্বে অবাস্থিত। এই স্থানে নিম কাঠের মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বর্তমানে ওঠানের পাশে এক অস্থায়ী চালায় পূজিত হচ্ছেন।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার লিখেছেন ঠাকুরফকির কর্তৃক বাদেকুশিয়ারকুল পরগণায় মহাপ্রভু আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য আখড়ার স্থলটি কুশিয়ারকুল পরগণায় অবস্থিত।

ধ্বংশস্তূপ পরীক্ষা করে দেখা যায় মন্দিরের দেওয়ালগুলি প্রায় ৫´ পুরু পাতলা পুরোনো ইটের গাঁথানি সম্বলিত ছিল। সামনের দিকে এবং অভ্যন্তরে মন্দির গাত্রে পোড়া মাটির অপূর্ব অলংকরণ এক সু-নিপুণ শিল্পসুষমামন্ডিত নান্দনিক রূপচর্চ্চার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন কোনো কুশলী তক্ষণশিল্পী কিংবা সূত্রধরের উপস্থিতির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

চূণ, সুরকি, পোড়ামাটি এবং বিভিন্ন মাপের পাতলা ইট ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করেই এই স্থাপত্য কীর্তিটি দাঁড় করানো হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন সাধারণ গৃহস্থ এমনকি বহু ধনাঢ্য ব্যক্তিও তা কল্পনা করতে পারেননি। তদুপরি স্থানীয়ভাবে এ উপকরণ কিংবা দক্ষ সূত্রধর সহজলভ্য ছিলনা। নিশ্চিতই এদেরকে আনা হয়েছিল দূরবর্তী কোনো অঞ্চল থেকে যেখানে ওরা কৌমসমাজভুক্ত হয়ে থেকে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দলবদ্ধভাবে বরাত পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মাণকার্য্যে বেরিয়ে পড়ত। এবং এরাই প্রয়োজন অনুসারে যেখানে যে উপকরণের প্রয়োজন তা যোগাড় করত কিংবা নিজেরা তৈরি করে নিত।

কুশিয়ারার কুলঘেষা পলিমাটিসৃষ্ট এ অঞ্চলের মৃত্তিকা ইট ও টেরাকোটা ইত্যাদি তৈরি করার জন্য আদর্শ। সংলগ্ন নদীপথ উপকরণ আনয়ন কিংবা যাতায়াতের মুখ্য মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল নিশ্চয়।

প্রধান মন্দির নির্মাতা স্থপতিরা সূত্রধর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং এঁরা বিভিন্ন 'গোষ্ঠী' বা 'থাকে'র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মধ্যযুগীয় বাংলায় এঁদের গোষ্ঠী বা থাকগুলি হল-১। বর্ধমান থাক, ২। অষ্টকুল থাক, ৩। ব্রহ্মযজ্ঞীয় থাক, ৪। পূর্ববঙ্গ থাক-, এঁদের বিচরণক্ষেত্র ছিল প্রধানত উত্তর ও পূর্ববাংলা এবং আসাম নিয়ে। মধ্যযুগীয় মন্দির সূত্রধরদের এসব 'থাক' বা গোষ্ঠীরা সারা পূর্বাঞ্চলে-অঞ্চলভেদে প্রধানত 'চালা' 'চাঁদনি', 'দালান' (যেটি সাদারাশি মহাপ্রভু আখড়ায় গড়ে উঠেছিল), 'রত্ন' এবং 'দেউল' (সাদারাশি আখড়ায় ৬টি স্মৃতি সৌধ নির্মাণে এ রীতি প্রচলিত ছিল) ইত্যাদি স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী মন্দির নির্মাণ করে গিয়েছেন।

স্বাধীন সুলতানি আমলের শিলালিপি ঃ সুবা বাংলার অন্তর্গত বর্তমান করিমগঞ্জ জেলায় স্বাধীন সুলতানি আমলের কিছু কিছু স্বাক্ষর কালের গতি পেরিয়ে এখনও টিকে আছে। তাঁদের সার্বিক চিন্তাধারার প্রতিফলন এ অঞ্চলকেও প্রভাবিত করেছিল জাতিধর্ম নির্বিশেষে। স্বাধীন সুবা বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৫-১৪৭৬ খৃঃ) সুলতান হোসেন শান (১৪৯২-১৫১৯ খৃঃ) এবং তাঁর উত্তর প্রজন্মের সগৌরব অবস্থান এবং জনহিতকর কর্মকাণ্ডের স্মারক বর্তমান বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলায় এখনও পরিলক্ষিত হয়। সময়ে সময়ে এ অঞ্চলে এঁদের ভূমিদান ধর্মনিরপেক্ষতাকেই প্রমাণ করে। আরবি-ফার্সি ছাড়াও সংস্কৃত ভাষায় এদের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলায়। সুলতান গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহের (১৫৩২-১৫৩৮ খৃঃ) (হুসেন শাহের পুত্র) এরকমই একটি শিলালিপির ফটোগ্রাফ সরবরাহ করেছেন শ্রীপ্রতীপ মিত্র, যিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগ্রহালয়ের একজন কিউরেটার, যেটি পাওয়া গিয়েছিল রাজশাহী অঞ্চলে। লিপিটির ভাষা সংস্কৃতি কিন্তু হরফ বাংলার। বিশিষ্ট পন্ডিতবর্গের মতানুযায়ী এটি বাংলা বর্ণমালায় লিখিত সর্বপ্রথম শিলালিপি। শিলালিপিটি বর্তমানে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি এণ্ড মিউজিয়াম, রাজশাহীতে রক্ষিত আছে।

যাই হোক আমাদের বরাক উপত্যকার করিমগঞ্চ অঞ্চলেও স্বাধীন সুলতানী আমলের দুটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে যে গুলো নিয়ে প্রথম আলোকপাত করেছিলেন শ্রী সুজিৎ চৌধুরী। প্রথম লিপিটি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের, প্রাপ্তিস্থল কালীগঞ্জের একটি মসজিদ, অন্যটি তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহের, প্রাপ্তিস্থান সুপারকান্দি অঞ্চলের পীন্নগর কালীবাড়ীস্থিত বাদশার থান। উক্ত লিপিগুলোর ভাষা ফার্সি এবং পাঠোদ্ধার করেছেন গৌহাটি কটন কলেজের আরবি ভাষার অধ্যাপক ইয়াহিয়া তামিজি।

বদরপুর দুর্গ ঃ মোগল শাসনের প্রায় অস্তমিত পর্বে যখন বাংলার মসনদে নবাব আলিবর্দি খাঁ অধিষ্ঠিত ছিলেন এসময়ে (আনুমানিক ১৭৩৪ খৃঃ) বুন্দাশীল সীমান্ত অঞ্চল বহির্শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে শিলহটের নবনিয়োজিত নায়েব ফৌজদার (স্থানীয় অর্থে নবাব) প্রচলিত মোগল স্থাপত্য

রীতিতে এখানে একটি দুর্গ প্রস্তুত করান। সুদূর মীরাট থেকে আগত এই নবাব সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন কিছু মুসলমান এবং পর্তুগীজ গোলন্দাজ বাহিনী, যাদেরকে নিয়োজিত করা হয়েছিল উক্ত সীমান্ত রক্ষার্থে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, পুর্তুগীজ-আইরিশ দেশীয় লোকেরা জীবন ও জীবিকার সন্ধানে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ভারতে আসতে থাকেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারী গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করা। পরবর্তীতে মোগল সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর চাকরি খুঁইয়ে নিজেরা স্বতন্ত্র বাহিনী গড়ে তুলে এবং চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশীয় রাজা, প্রভাবশালী জমিদারদের হয়ে যুদ্ধকার্যে লিপ্ত হত। এজাতীয় বেসরকারী বাহিনীই ইতিহাস খ্যাত মার্সিনারী বাহিনী। ব্রহ্মযুদ্ধের মহানায়ক রিচার্ড পেম্বারটোন এরকমই এক বাহিনীর সেনানায়ক ছিলেন এবং 'ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির' হয়ে চুক্তির ভিত্তিতে কাছাড় মণিপুর থেকে মান (বার্মিজ) অপসারণ করে বিখ্যাত ইয়ান্ডাবু সন্ধির ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছিলেন।

হজরত শাহজালালের স্মৃতিধন্য দেওরালি পরগণাস্থিত সুলতানি মোগলানি জমানায় বুন্দাশীল এসময়ই এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান হয়ে উঠেছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলার নবাব কাশিমখান ১৬১২ খৃঃ বুন্দাশীলের থানাদারের সহযোগিতায় হেড়ম্ব রাজ্য আক্রমণ করে আসুরাটিকর ও প্রতাপগড় দখল করে নেন। উপায়ন্তর হেড়ম্বরাজ যশোনারায়ণ সন্ধির বিনিময়ে রাজ্য রক্ষা করেন। চুক্তি অনুসারে মোগল সম্রাটকে ৪০টি হাতি ও নগদ কুড়ি হাজার টাকা, বাংলার নবাবকে ৫টি হাতি ও নগদ কুড়ি হাজার টাকা এবং বুন্দাশীলের থানাদারকে ২টি হাতি ও নগদ কুড়ি হাজার টাকা দিতে হয়েছিল।

পরবর্ত্তীতে বুন্দাশীল অর্থাৎ বদরপুরে গড়ে ওঠা দুর্গাটি ১৭৯৯ খৃঃ একবার আক্রান্ত হয়েছিল। যিনি মোহম্মদ রেজা নামক এক মোগল কাছাড়ীরাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে পরাস্ত করে বিজয় পর্বে এ দুর্গ অধিকার করেন। পরবর্ত্তীতে শ্রীহট্ট থেকে প্রেরিত কল্যাণসিং সুবেদারের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে এবং পাঁচটি কামানও হস্তচ্যুত হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের দ্রোহতট লাতু

১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর রাজ আনুমানিক ১০ টায় চট্টগ্রাম ৩৪ তম নোটিভ ইনফেনট্রি'র সেনাদল যখন হাবিলদার রজবআলী খান বা রজবুলী খানের নেতৃত্বে অস্ত্রাগার এবং কোষাগার লুণ্ঠন করে (২,৭৮,২৬৭/টাকা) বিদ্রোহের সূচনা ঘটায় তখন তারা ভাবেনি পূবোর্ত্তরের মাটি তাদের স্বাধীনতার স্বপ্নিল পথে বিষাক্ত কাঁটা বিছিয়ে রেখেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল ত্রিপুরা সিলেট নেপাল যাত্রা। বিদ্রোহ সমকালীন লেখক চার্লস্ র‍্যাথবোনের মতে চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য ছিল ঢাকার ৭৩ নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে যৌথভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। যাইহোক ১৯ নভেম্বর শেষ রাতে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে লুণ্ঠিত দ্রব্য ও ৩টি হাতি নিয়ে যখন বিদ্রোহীরা স্বাধীন ত্রিপুরায় ঢোকে, তখন কোম্পানি পদানত এ রাজ্যে তারা সর্বস্ব খুঁইয়ে কুমিল্লা সিংগার বিল অতিক্রম করে শ্রীহট্টের মৌলভীবাজারের লংলায় আসে। ক্ষুধার্ত নিরাশ্রয়ী মহিলা শিশু সন্তান সমেত প্রায় ৪০০ বিদ্রোহী সেনানীদের খাদ্য ও আশ্রয় প্রদান করেন স্থানীয় ধর্ম প্রাণ জমিদার গৌছ আলি খান। জনৈক বন্দীর জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে, গৌছ আলি ৫০০০ সিপাহী সহ বিদ্রোহীদের দলে যোগদানের পক্ষে ছিলেন, অবশ্য সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে তিনি এ অভিযোগ থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। অতঃপর ব্রিটিশ বাহিনীর তাড়া খেয়ে বিদ্রোহীরা পাথারকান্দির পশ্চিম প্রান্তে প্রতাপগড় হয়ে পাহাড়ী রাস্তা ধরে লাতু এসে পৌঁছয় বিদ্রোহ শুরুর ঠিক একমাস পর অর্থাৎ ১৮ই ডিসেম্বর। কোম্পানি অনুগত মৈনার চৌধুরীদের বিশ্বস্ত রায়ত কালা মিঞারগোপন সংবাদে সরকারী বাহিনী বিদ্রোহীদের লাতু অবস্থানের কথা জানতে পারে।

রাজস্ব বিভাগের অফিসার মিঃ এলেনের নির্দেশে মেজর বিং এর নেতৃত্বে সিলেট লাইট ইনফেন্ট্রির ১৬০ জন সেনা লাতু অভিমুখে রওনা দেয়। বিদ্রোহীরা বর্তমান করিগঞ্জ জিলার তৎকালীন প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল লাতুর মালেগড় (কোষাগার) টিলায় আশ্রয় নেয়, যেটি লঙ্গাই নদীর বাম তীরে অবস্থিত এবং লাতু বাজারের ঠিক দক্ষিণে।

উপরে টিলায় অবস্থিত ঝঞ্জুনবিধ্বস্থ বিদ্রোহী বাহিনী এবং নীচে নদীতীরে মেজার বিং ও তার দেশীয় সেনা বিদ্রোহীদের ভাষায় 'খৃস্টান কা কুত্তা'। রণক্ষেত্রে মেজর বিং সহ সরকারী বাহিনীর পাঁচ জওয়ান এবং বিদ্রোহীদের ৩০ জন নিহত হয়। লোকশ্রুতি সে, হাবিলদার রজব খানের বিদ্রোহিনী স্ত্রীও এসময় নিহত হন, যদিও তথ্যটি সরকারী সমর্থিত নয়। ৩০ জন মৃত সহযোদ্ধাদের মালেগড় টিলায় শায়িত রেখে বিদ্রোহীরা পূর্বদিকে বেদরং-পাথু-মাইজগ্রাম হয়ে বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ বিশকুটে পৌঁছয়। সেখানকার জমিদার এদের আশ্রয় দানে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। পলায়নপর স্বাধীনতাকামী সেনানীরা আনাইর হাওর-বদরপুর ঘাটের পাহাড়-মোহনপুর-জালেঙ্গা-চাতলা-বিন্নাকান্দি হয়ে অগণিত সহযাত্রী একের পর এক খুঁইয়ে মণিপুর অভিমুখে পালাতে থাকে। পরিস্থিত এমনই প্রতিকূল হয়েছিল যে কোলের শিশুকেও মাঝপথে তাদের ফেলে যেতে হয়েছিল। কাছাড়ের সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ স্টুয়ার্ট সে সময় দুর্ধষ কুকীদেরকেও নিধনযজ্ঞে নামিয়ে ছিলেন। তাদেরকে বলা হয়েছিল 'লালকোট গায়ে ভারী বোঝা কাঁধে' লোক দেখলেই ধরে নেবে ওরা জঙ্গি। মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে কৃতকার্য্যে সাফল্য লাভ করেছিল কোম্পানি কর্ত্তৃপক্ষ। সেসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পুরস্কার স্বরূপ 'কাছাড় টি কোম্পানির' ম্যানেজার ডেভিডসন ব্রিটিশ প্রদত্ত ১৬,৫০৮ একর ভূমি লাভ করেছিলেন।

শ্রীহট্ট কাছাড়ে সর্বমোট ২২৯ জন স্বাধীনতাকামী সেনানী নিহত হয়েছিলেন, এদের মধ্যে ১৮৫ জন কাছাড়ে এবং শ্রীহট্ট-ত্রিপুরায় ৪৪ জন।

বরাক উপত্যকার সম্ভাবনাময় পর্যটনকেন্দ্র শণবিল ঃ করিমগঞ্জ জেলার দোহালিয়া এবং সরসপুর শৈলশ্রেণীর মধ্যবর্ত ভূখণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাগর সদৃশ সরোবর শণবিল। এগারসতী পরগণা অন্তর্গত শণবিলের পূর্বপার বরাবর একসময় সিলেটের কৃতী পুরুষ গিরিশ রাজার অনেকগুলো কাছাড়ী ছিল, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডলু কাছারী, কালীনগর গ্রামের সুরুচীগঞ্জ কাছারী ইত্যাদি। এ অঞ্চলের সহায়ক স্রোতস্বিনী যেমন সিঙ্গি, ডলুগাঙ, সিংলা কিংবা কচুয়া ইত্যাদি সারা বছরই নাব্য ছিল তখন। এ অঞ্চলে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম-এ স্রোতস্বিনীগুলো আমাদের বর্তমান আধুনিক সভ্যতার আলোকে এসে রবিঠাকুরের কথায়—

'যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,

সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে।'

যথার্থ সাক্ষ্য বহন করে আজ কোনক্রমে দাঁড়িয়ে আছে।

চিরায়ত ও লোকায়ত সংস্কৃতির ঐতিহ্যে ভরপুর জনসমাজ নিয়ে গড়ে ওঠা চতুঃসীমার গ্রামগুলি হল — উত্তরে কালীগঞ্জ ও সন্নিহিত অঞ্চল, দক্ষিণে — কুরিখালা, ভবানীপুর, পদ্মারপারও সিঙ্গিরপার, পূর্ব - গল্লাশাইল, ডব্লু, কালীবাড়ী, দেবদ্বার, সিপাহীটিলা, হন্দরমোকাম এবং পশ্চিমে দোহালিয়ার কূলঘেষা নগেন্দ্রনগর, ফাকুয়াগ্রাম-এবং অন্যান্য জনপদ। প্রায় ১৫ বর্গ কি. মি. আয়তন নিয়ে অথৈ জলের আধার শণসরোবরে পৌছার সহজতর রাস্তা

অনেকগুলি আছে। এরমধ্যে একটি শিলচর করিমগঞ্জ সড়ক পথের নগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনে নেমে-যেখানে নবাব রাধারামের স্মৃতিবিজড়িত গ্রাম ছুঁয়ে শণবিলের কূলঘেষে অপেক্ষারত নোকায় পা রাখা যায়।

আমাদের এ অঞ্চলে ঐতিহাসিক গবেষণা দূরে থাক প্রত্ন অনুসন্ধান এবং ঐতিহ্যের সংরক্ষণ চেতনাই এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি। জ্ঞান এবং সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটি সম্পর্কে আমাদের গুণীজন সমাজ আগ্রহবোধ করেন এমন আশা নিয়েই একান্ত প্রাথমিক এই আলোচনার অবতারণা।

নির্দ্দেশপঞ্জী ঃ

১। A Statistical Account of Assam — by W. W. Hunter

২। Cachar under British Rule in North East India — by Dr. Jayanta Bhattacharjee

৩। Folklore & History — by Sujit Choudhury

৪। The Mutiny Periof in Cachar — Ed. by Sujit Choudhury

৫। Census of India 1961 Assam, Dist. Census Handbook Cachar — Ed. by E. H. Pakyntein

৬। বাঙালীর ইতিহাস — (আদিপর্ব) —নীহাররঞ্জন রায়।

৭। শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস (অখণ্ড সংস্করণ) —শ্রী সুজিৎ চৌধুরী

৮। শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা, শিলং

৯। মহাবিদ্রোহের দ্রোহগাথা জঙ্গীয়ার গীত —শ্রী সুবীর কর।

১০। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ) —অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

১১। বাংলার মন্দির ঃ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য —প্রণব রায়।